आचार्य
श्री नरेंद्र मोदी

ACHARYA (CHANCELLOR)
SHRI NARENDRA MODI

उपाचार्य
प्रो. विद्युत चक्रवर्ती

UPACHARYA (VICE-CHANCELLOR)
PROF. BIDYUT CHAKRABARTY

विश्वभारती

VISVA-BHARATI

(Established by the Parliament of India under
Visva-Bharati Act XXIX of 1951
Vide Notification No. : 40-5/50 G.3 Dt. 14 May, 1951)

संस्थापक
रवीन्द्रनाथ ठाकुर

FOUNDED BY
RABINDRANATH TAGORE

शांतिनिकेतन - 731235
SANTINIKETAN - 731235
जि.वीरभूम, पश्चिम बंगाल, भारत
DIST. BIRBHUM, WEST BENGAL, INDIA
फोन Tel: +91-3463-262 451/261 531
फैक्स Fax: +91-3463-262 672
ई-मेल E-mail: vice-chancellor@visva-bharati.ac.in
Website: www.visva-bharati.ac.in

सं./No._____

दिनांक/Date._____

সপ্তম বার্তালাপ

আমার সহকর্মীবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রী এবং গ্রাসাচ্ছাদন ও ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির প্রশ্নে বিশ্বভারতীর উপর নির্ভরশীল বন্ধুদের উদ্দেশে—

১ আগস্ট ২০২০

আমি এই বার্তালাপটা শুরুই করব একটা দায় স্বীকার করার মর্মে বিজ্ঞপ্তি জানিয়ে রেখে! এই বার্তালাপটি উপস্থাপন করছি একইসঙ্গে খুশি আর দুঃখ নিয়ে। খুশি, কারণ বার্তালাপগুলো সাধারণ মানুষের; বিশেষ করে যাঁরা রবীন্দ্রানুরাগী মানুষ(তা সে খাঁটি অনুরাগই হোক আর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থ চরিতার্থতার জন্যই হোক!) নজর টেনেছে। আর দুঃখের কারণটা হল, যাঁরা এই বার্তালাপগুলি নিয়ে নানারকম মন্তব্য করছেন(যাঁদের মধ্যে বিশেষ করে রয়েছেন দুজন আশ্রমিক যাঁরা বিশ্বভারতীর সঙ্গে একদা কোনওভাবে যুক্ত ছিলেন এবং বিশ্বভারতী থেকে যাঁদের অন্নসংস্থান হত!) অথচ, সম্ভবত বার্তালাপগুলো সম্পূর্ণ পড়ে দেখার ধৈর্য দেখাতে পারেননি! প্রত্যেক বার্তালাপ কমপক্ষে ২০০০ শব্দে লেখা। তাহলে সবকটা বার্তালাপ পড়তে গেলে ১২০০০ শব্দ পড়তে হয়। এই ধৈর্যহীনতার পরিচয়ই প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের এইসব স্বঘোষিত অভিভাবকদের মন্তব্যে। কথায় বলে, 'পরিপূর্ণ অজ্ঞতা সেও শ্রেয়স্কর/ অর্ধজ্ঞান তদপেক্ষা বেশি ভয়ংকর!' বিশ্বভারতী এবং তার মহতী ঐতিহ্যের সঙ্গে 'স্বভাবত ওতপ্রোত জড়িয়ে আছেন' বলে দাবি করে থাকেন যাঁরা(কেন যে সে দাবি তা অবশ্য কেউ জানে না বা তা কখনও প্রকাশ্যে আসে না!) তাঁদের কাছে আর্জি, আপনাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে জনপরিসরে প্রকাশিত আমার বার্তালাপগুলির মর্মার্থ একটু বোঝার চেষ্টা করুন। আমিও খুব হতাশ হই, যখন দেখি আশ্রম নিয়ে যাঁরা সচরাচর উদ্বেগ প্রকাশ করেন (মূলত গণমাধ্যমের সামনে মন্তব্য করে), বিশ্বভারতীর সাম্প্রতিক কোনও কর্মসূচিতেই (অন্যসব বাদই দিলাম। পৌষমেলা ও বসন্তোৎসবের মতো বছরের দুটো বড় মহাপার্বণে অন্তত) তাঁদের উপস্থিতি প্রায় নজরেই পড়ে না!

আমি আবারও বলি, আমার এই সাপ্তাহিক বার্তালাপগুলির উদ্দেশ্য হল 'ন্যাক' মূল্যায়নে বিশ্বভারতী কেন বি+ পেল কিংবা এনআরআইএফ-এর মানদণ্ডে পঞ্চাশতম হল তার নেপথ্যের কারণগুলির খতিয়ে দেখা। আমাকে কারণগুলো খুঁজে দেখতে হচ্ছে কারণ আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমরা যাঁরা গল্পকথার সেই সোনার ডিমপাড়া হাঁসের মতো এই বিশ্বভারতীর অন্নজলে প্রতিপালিত হচ্ছি; এবং নামযশ অর্জন করেছি— তাঁদের সবারই বিশ্বভারতীর উত্তরাধিকার রক্ষার দায় ও দায়িত্ব আছে। উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত বিশ্বভারতীর গৌরবময় ঐতিহ্য আমরা কি সত্যিই ধরে রাখতে পেরেছি? সম্ভবত এর উত্তর হল 'না'। আমার আগের বার্তালাপগুলোতে তার কারণগুলো বলবার চেষ্টা করেছি; যা বিশেষ করে সেইসব মানুষের কানে স্বভাবতই মিঠে শোনাবে না যাঁরা বীরভূমের 'একতম শিল্প' বলে আমি আগে যাকে উল্লেখ করেছিলাম;—সেই বিশ্বভারতীকে পুরোপুরি ধ্বংস করে না ফেলতে পারলেও তার সমূহ ক্ষতিসাধনে জ্ঞাতসারেই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। বিশ্বভারতীর বেশ কয়েকজন প্রাক্তন উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়ার পর বিশ্বভারতীর দ্রুত অবনমনের কথা প্রকাশ্য-পরিসরে লিখেছেন। আমিও সেই ধারা অনুসরণ করতে পারতাম। কিন্তু তা না করে বিশ্বভারতী-পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে আমার কার্যকালেই বার্তালাপগুলো প্রকাশ্য করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি এই সিদ্ধান্ত নিলাম যাতে সমস্যাগুলো খানিকটা বাগে আনতে পারি; এবং বিষয়গুলি নিয়ে খোলাখুলি কথা বলে বিশ্বভারতীর উত্থানের পথে প্রতিবন্ধক এই সমস্যাগুলো আটকাতে পারি। বিশ্বভারতীর প্রতি যাঁদের আন্তরিক অনুরাগ আছে এবং তারজন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করেন তাঁদের আলাদা করে দেখানো অবশ্যই আমার উদ্দেশ্য নয়, বরং আমার উদ্দেশ্য সেইসব ব্যক্তিবিশেষ যাঁদের বিশ্বভারতীর জন্য বস্তুত কোনও কাজ করেন না; অথচ বকধার্মিকের মতো শুধু খুঁত ধরবার জন্য তর্জনী উঁচিয়ে থাকেন!

এই বার্তালাপগুলির আদৌ উদ্দেশ্য নয় বিশ্বভারতীর ভিতরের কলুষ প্রকাশ্য করা; কারণ যার উপাচার্য হিসেবে আমি এখন নিযুক্ত সেই মহতী প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হতে পারে তেমন কাজ যে আমার করা উচিত নয় সেবিষয়ে আমি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। আমাদের সমূহ আত্মসমীক্ষা ও অন্তর্দর্শন হোক;— এইগুলির মাধ্যমে সময়ের সেই দাবিকে প্রতিষ্ঠা দেওয়াই আমার একান্ত উদ্দেশ্য। স্মরণ করুন, আমাদের পূর্বসূরিরা কতদিনের কত কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করে বিশ্বভারতীকে বিদ্যাচর্চা ও বিদ্যা-বিতরণের একটি অনন্য কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন! আশ্রমের দিকে তাকালেই তা অনায়াসে বোঝা যায়!

আমাদের করণীয় কী?

আমি দায় অস্বীকারের মর্মে আরেকবার একটা বিবৃতি দিয়ে রাখতে চাই। আমার বিচার-বিবেচনা মোতাবেক আমাদের করণীয় এবং অকরণীয় বিষয়ের যে তালিকা নীচে দেওয়া হল তা কোনওভাবেই চূড়ান্ত নয়। আমি আমার সহকর্মী, ছাত্র-ছাত্রী এবং বিশ্বভারতীর ভালমন্দের শরিক অন্য সবাইকে অগ্রণী হয়ে এই তালিকা সম্পূর্ণ করার আহ্বান জানাই। আমি প্রস্তাবগুলি তাঁদের সঙ্গে ভাগ করে নেব যাঁরা বিশ্বভারতীকে অতীতের সমুচ্চ মহিমায় পুনরায় উত্তীর্ণ করার কঠিনব্রতে স্বেচ্ছায় অংশ নিতে চাইবেন।

১। **অংশগ্রহণ:** বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে বিশ্বভারতী বস্তুত একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে অবস্থান করে। আমরা সপ্তাহান্তিক ছুটি বুধ-বৃহস্পতিবার থেকে শনি-রবিবারে পরিবর্তন করেছি। শিক্ষাসমিতি ও কর্মসমিতিসহ শিক্ষক শিক্ষাকর্মী এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আমাদের অনেকগুলি মিটিঙে এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে দুটি যুক্তি উপস্থাপিত হয়: ক) শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী— উভয়পক্ষ থেকেই বলা হয় সপ্তাহের মাঝে বুধ ও বৃহস্পতিবার যখন তাঁরা বাড়ি ফেরেন তখন তাঁরা তাঁদের স্ত্রী/স্বামী বা সন্তানদের কদাচিৎ সঙ্গ পান যেহেতু তাঁদের তখন হয় অফিসে বা স্কুলে থাকতে হয়। খ) যেহেতু বুধবার এখানে ছুটির দিন তাই শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী ও শিক্ষার্থীদের সপ্তাহমধ্যের একটা কাজের দিনে অন্য কাজ পড়ে যায় বলে মন্দিরে যোগ দিতে পারেন না। দুটি যুক্তিই সংগত। শনি-রবিবার ছুটির দিন ঘোষণা করার পর দেখা গেল দ্বিতীয় যুক্তিধারীদের বক্তব্যের মধ্যে প্রবঞ্চনা ছিল; মন্দিরে যোগ দেওয়ার ইচ্ছার কথা বলে (ছুটির দিনবদলের পক্ষে) দলে ভারী হওয়া ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। নিয়মিত অনুষ্ঠিত বুধবারের সাপ্তাহিক উপাসনা থেকে তা প্রমাণ হয়। আশ্রমের ১৫০০০ সদস্যের মধ্যে অস্বাভাবিকরকম কম সদস্য বুধবারের সমবেত উপাসনায় যোগ দেন! এইমুহূর্তে অবশ্য কোভিড-১৯-এর কিছু বিধিনিষেধের কারণে ও ছাত্র-ছাত্রীদের আশ্রমের বাইরে থাকার কারণে স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যাটা কমেছে, কিন্তু শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের উপস্থিতি প্রত্যাশা করা খুব অন্যায় নয়।

২। **বৈতালিক:** একই কথা প্রযোজ্য বৈতালিক প্রসঙ্গেও যা আশ্রমের বিশেষ বিশেষ সাংস্কৃতিক পার্বণের আগে অনুষ্ঠিত হয়; এবং যা রাবীন্দ্রিক সংস্কৃতির অন্যতম আঙ্গিক। আমার পুনঃপুন অনুরোধের পর শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা সামান্যই বাড়ানো গেছে। বেশিরভাগ সহকর্মী এতে যোগ দিতে না-পারার কারণ হিসেবে তাঁদের সকালে ঘুম থেকে উঠতে না-পারার যুক্তি দেন; যদিও সারাবছরে এমন প্রভাতী বৈতালিকের সংখ্যা নিতান্তই কম। অন্যসময় অবশ্য আমার সহকর্মীরা খুশি হয়েই সকাল-সকাল উঠে পড়তে পারেন, যেমন গণদেবতা এক্সপ্রেস কলকাতা থেকে বেশ ভোর-ভোর ছাড়ে! আমি জানি আমার অনেক সহকর্মীকেই প্রতিসপ্তাহে এই ট্রেন ধরতে হয়। এরথেকে বোঝা যায় বছরে চার-পাঁচবার বৈতালিকের জন্য সকাল-সকাল উঠতে না-পারাটা কারণ নয়, কারণটা হল বৈতালিকে যোগ দেওয়ার আগ্রহের অভাব।

৩। **পৌষমেলা:** ২০১৯ সাল থেকে পৌষমেলার উপর আমি মনোযোগ দিই; যেহেতু এর পরিচালনার কাজকর্মের সঙ্গে আমি নিবিড়ভাবে যুক্ত হই। মেলা শুরুর দশদিন আগে থেকে ক্যাম্প অফিস চালু করি এবং উপাচার্যের গোটা দপ্তরটাকে ক্যাম্প অফিসে স্থানান্তরিত করা হয় যাতে স্টল ও অন্যান্য পরিকাঠামো তৈরি হওয়ার সময় সবসময় তত্ত্বাবধান করা যায়। মনে রাখতে হবে এবারের এই মেলা ছিল বিশেষত্বপূর্ণ, কারণ গত কয়েকদশকে এই প্রথম সামগ্রিকভাবে মেলা-পরিচালনায় অংশ নিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষাকর্মী এবং অবসরপ্রাপ্তেরা। আমাকে এই বিপুল কর্মযজ্ঞে সাহায্য করেছেন অল্পকিছু সহকর্মী যাঁরা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কায়েমি স্বার্থজনিত প্রবল প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও দিনরাত পরিশ্রম করে জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশনা অনুসারে মেলা সম্পন্ন করেছেন। একটা পরিসংখ্যান নেওয়া যাক। ৪৫৩জন সহকর্মী মেলার জন্য গাড়ি চলাচলের অনুমতিপত্র নিয়েছিলেন। তার মধ্যে বড়জোর পঞ্চাশজন মসৃণভাবে মেলা পরিচালনার জন্য স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর-প্রেরিত ১০০জন নিরাপত্তাকর্মী এবং নিয়মিত মেলা পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সত্য সাঁই ট্রাস্টের ১৮০জন স্বেচ্ছাসেবীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

৪। **আপনবোধ:** নভেম্বর ২০১৮-তে বিশ্বভারতীতে যোগ দেওয়ার পর যে জিনিসটা আমার খুব অবাক লাগল তা হল আমরা যাঁরা তার উপর নির্ভর করে বেঁচে আছি, নামযশ পাচ্ছি— তাঁদের বিশ্বভারতীর প্রতি 'আপনবোধ'-এর নিদারুণ অভাব! বিশ্বভারতীর কর্মী এবং বিশ্বভারতী-কেন্দ্রিক শাঁসালো পর্যটন-ব্যবসায়ীরা বছরভর একটা ভালরকম রোজকারের পন্থা হিসেবে জায়গাটাকে মেকি রবীন্দ্রতীর্থ বানিয়ে ছেড়েছে; যেন বিশ্ববিদ্যালয় সবার রোজগারপাতির এজমালি সম্পত্তি! বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি যথার্থ অনুরাগের নিদারুণ অভাব্ই এর কারণ। এযাবৎ ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থতার মাধ্যম হিসেবেই শুধু ব্যবহার করা হয়েছে বিশ্বভারতীকে। তা নাহলে বিভাগ বা ভবনের সহকর্মীদের মধ্যে নোংরা কোন্দল থামাতে ঘনঘন উপাচার্য বা বরিষ্ঠ আধিকারিকদের ছুটে যেতেই বা হয় কেন?

'আপনবোধ' বলতে আমি কী বোঝাতে চাই? বিশ্বভারতীর হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের একটা লড়াই যখন জারি হয়েছে তখন তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বাধা আসবে তা একরকম অনিবার্য। এতদিন কর্মরত প্রশাসন কীভাবে কাজ করেছেন তা যে-কেউ একঝলক তাঁদের কর্মপন্থা দেখলেই বুঝতে পারবেন। তাঁরা **অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদগুলো** শুধু খানিকটা কমিয়ে আনাকেই একতম লক্ষ্য মনে করতেন। অন্যদিকে বর্তমান প্রশাসন এযাবৎকাল জিইয়ে রাখা দুর্নীতির রন্ধ্রপথগুলো বুজিয়ে ফেলতে বদ্ধপরিকর। সেইজন্য এখন জিপিএফ-এর লক্ষ-লক্ষটাকা তুলে নেওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয় না, যতক্ষণ না আবেদনকারীর কাছ থেকে এই সুবিধা পাওয়ার জন্য নির্ধারিত কাজ ও শর্ত আদায় হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মধারায় দৃশ্যত একটা পরিবর্তন লক্ষ করা গেলেও রবীন্দ্র-সংস্কৃতির স্বঘোষিত অভিভাবকেরা কালক্ষেপ না করে গুরুদেবের সামাজিক-অর্থনৈতিক আদর্শ-অনুসারে জমিতে নেমে করা আমাদের কাজগুলিকে 'রবীন্দ্রসংস্কৃতি-বিরোধী' বলে অপপ্রচার করে থাকেন। সেইজন্যই এটা অস্বাভাবিক মনে হয় না যে, আমাদের গঠনমূলক কর্মসূচি: যেমন করোনা ভাইরাস অতিমারির সময় আশ্রমের চতুষ্পার্শ্বের গ্রামের কাজ-হারানো বিপন্ন মানুষের পাশে ত্রাণ-সাহায্য পৌঁছে দেওয়া, বা আমাদের জেলার শহিদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য অর্থসংগ্রহ-অভিযান, কিংবা ক্যাম্পাসে পার্থেনিয়াম নির্মূলীকরণের মতো কর্মসূচিতে তাঁদের দেখা মেলে না! বেশ মজার ব্যাপার হল, যখন এইসব কর্মসূচি নেওয়া হয় তখন বিশ্বভারতীর পূর্বোল্লিখিত 'অভিভাবক বা জিম্মাদারেরা' অর্থসাহায্য করে অংশগ্রহণ করতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হয়ে ওঠেন; এবং নিজেদের স্বাস্থ্য নিয়ে বড় বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন! তাঁদের অসম্মতি-জ্ঞাপনের কতকগুলো নির্দিষ্ট ধরন আছে। ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় মানবসম্পদবিকাশ মন্ত্রীকে চিঠি লিখে উপাচার্যকে ভয় দেখানো হয়! আমাদের স্বঘোষিত 'রাবীন্দ্রিক' বন্ধুদের জন্য আমার একটি বিনীত প্রস্তাব আছে: যদি প্রশাসনের অভিপ্রায় ও কাজকর্ম সম্পর্কে আপনাদের তথ্য পেতে কোনও অসুবিধা হয় তাহলে দয়া করে বিশ্বভারতীর ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশিত আমার বার্তালাপগুলিতে একটু চোখ বোলান। যদি তাতেও আমাদের আন্তরিকতা সম্পর্কে আপনাদের সন্দেহভঞ্জন না হয় তাহলে আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজে নেমে পড়ুন, তাহলেই স্বচক্ষে দেখতে পাবেন কতখানা নিষ্ঠা ও ভালবাসা নিয়ে আমরা বিশ্বভারতীর ভালর জন্য কাজ করি।

৫। **অধিকারবোধ:** ২০১৮ সালে যখন আমি বিশ্বভারতীতে যোগ দিলাম তখন সবসময় একদল সহকর্মী আমাকে ঘিরে থাকতেন। তা দেখে আমার অন্য এক সহকর্মী বলেছিলেন, 'স্যর, আপনার চারপাশ ঘিরে আছে ক্যাগ আর ক্যাস!' তখন আমি সাংকেতিক কথাটার মানে বুঝতে পারিনি। আমার সহকর্মী ব্যাখ্যা করে বললেন, 'ক্যাগ' হলেন তাঁরা যাঁরা 'ক্যাগ'-প্রেরিত অডিট টিমের কাছে নিয়ম-বহির্ভূত সুবিধা নেওয়ার দায়ে অভিযুক্ত। আর 'ক্যাস' হলেন সেইসব লোক যাঁরা পদোন্নতির আশায় উপাচার্যকে ঘিরে থাকেন। আমি উপলব্ধি করলাম কথাটা হয়তো ভুল নয়। তা নাহলে ২০১৯ সালের ১০ মার্চ গান্ধীপুণ্যাহে এত আশ্চর্যরকম বেশি জমায়েত হল কী করে; যেদিন কিনা 'ক্যাস' প্রমোশনের ইন্টারভিউয়ের দিন! ওই লোকগুলো শুধু তাঁদের প্রমোশনে আনুকূল্যের আশাতেই সেদিন ভিড় করেছিল আমার এই ধারণা দৃঢ় হয়েছে কারণ ২০২০ সালের গান্ধীপুণ্যাহের দিন আর তাঁদের টিঁকি দেখা যায়নি!

৬। **অঙ্গীকার:** যে-কোনও যৌথ-উদ্যোগের মতোই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমৃদ্ধির জন্যও প্রয়োজন হয় সমবেত লক্ষ্যসাধনের উদ্দেশ্যে সমমনস্ক মানুষের একত্রীকরণ। কাজটা কঠিন মনে হতে পারে যদি না সমষ্টির স্বার্থকে ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে তুলে ধরা সম্ভব হয়। বিশ্বভারতীর সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে যে-জিনিসটা প্রত্যাশিত তা হল এই মহতী বিদ্যাতীর্থটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুদেব যে মূল্যবোধ ও আদর্শের কথা বলেছিলেন তার প্রতি অঙ্গীকার গ্রহণ। আমি যে অঙ্গীকারের কথা বলছি তা তথাকথিত 'রাবীন্দ্রিক' মূল্যবোধের নামে শুধু মুখেই বলে যাওয়া হয়। প্রয়োজন হল মাটিতে নেমে হাতে হাত রেখে মাটির কাছের মানুষদের সক্ষম করা, দক্ষ করে তোলা এবং তাঁদের ক্ষমতায়ন ঘটানো। বিদ্যাচর্চার সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুবৃত্তির যে অনবদ্য সংমিশ্রণের ধারা বিশ্বভারতীতে রয়েছে তা স্বীকার করা এবং আরও দৃঢ় করার ক্ষেত্রে আমাদের সবারই একটা ভূমিকা রয়েছে। এখানে গুরুদেবের উক্তি স্মরণ করলে অন্যায় হবে না: ১৯৪০ সালে সম্পাদক-লেখক সজনীকান্ত দাসকে তিনি খুব স্পষ্ট করে বলেছিলেন, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অনেকেই সমাজ-উন্নয়নের নামে বিভাজনপন্থার রাজনীতিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন!

৭। **কঠোর শ্রম:** কঠোর শ্রমস্বীকারের কোনও বিকল্প নেই এবং তার সত্যতা প্রমাণেরও কোনও আবশ্যকতা নেই। দুঃখের ব্যাপার হল একজন ছাত্র বা ছাত্রী তাঁদের গবেষণা কিংবা গবেষণা-উত্তর ডিগ্রি লাভের জন্য সাধারণত কঠোর পরিশ্রম করেন; এবং একবার অ্যাকাডেমিক ডিগ্রিটি স্থায়ীভাবে হস্তগত হওয়ার পর তাঁদের বিদ্যাচর্চাও নাটকীয়ভাবে পড়ে যায়! এই প্রবণতার সর্বজনস্বীকৃত ব্যাখ্যাটি হল, যখন বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে কেউ চাকরি পান;— বিশেষ করে ভারতের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে— তারপর আর তাঁর ধারাবাহিক গবেষণা-পারঙ্গমতার কোনও প্রমাণ দাখিল করতে হয় না। বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে আমলাদের মতো কোনও বার্ষিক গোপনীয় রিপোর্ট জমা দেওয়ার বিধি নেই যেভাবে ভারতীয় প্রশাসনিক কাঠামোর কেন্দ্রস্থ ব্যক্তিদের কঠোর মূল্যায়নের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগ নতুন নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে যোগ্যতার পরিমাপক হিসেবে নির্দিষ্ট এপিআই স্কোরের প্রবর্তন করেছে। এই নতুন পরিমাপন ব্যবস্থায় যেখানে গবেষকদের নতুন নতুন কাজে নিয়ত সৃজনশীল রাখার কথা, দুর্ভাগ্যজনকভাবে দেখা যাচ্ছে সেখানেও গবেষকদের উচ্চ এপিআই পাইয়ে দেওয়ার সাংঘাতিক দুষ্টচক্র গড়ে উঠেছে। আমি বিশ্বভারতীর অভিজ্ঞতাসূত্রেই বিষয়টা একটু বিস্তারে বলতে চাই। আমি কাজে যোগ দেওয়ার পরপরই আমার সহকর্মীদের আশ্বস্ত করে বলেছিলাম যে 'ক্যাস' প্রমোশন হবে আমার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার;

এবং আমি সে প্রতিশ্রুতি রক্ষাও করেছিলাম। সাতষট্টি জন সহকর্মীর মধ্যে উনষাটজন যথাবিহিত নিয়মে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হন। সম্প্রতি আমার গোচরে এসেছে যে বেশ কিছু সফল প্রার্থীর এপিআই নিয়ম মেনে গণনা করা হয়নি, যেহেতু তাঁদের প্রকাশনা-তালিকার মধ্যে কুম্ভীলকবৃত্তি অবলম্বন করার অভিযোগ সত্ত্বেও সেগুলি এপিআইয়ের জন্য গণ্য করা হয়েছিল। তাছাড়া, একটি ভবনে (বিজ্ঞান বিষয়ক নয়) আগের জমানায় তিনজনকে প্রমোশন দেওয়া হয়েছিল এপিআই স্কোর ভুলভাবে গণনা করে। আমার নজরে এসেছে, যাঁদের ভুল করে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে তাঁরা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেওয়াকে সেমিনারে অংশগ্রহণ হিসেবে দেখিয়ে নম্বর পেয়েছেন। ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার জন্য একটি তদন্ত কমিটি তৈরি করা হয়েছিল কিন্তু কাজটা শেষ করতে দেওয়া হয়নি তার কারণ অনুমান করা খুব কঠিন নয়; যেহেতু, এখানে, বিশ্বভারতীতে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত-গ্রহণের সবস্তরই 'বড়দাদা'-ব্যাধির উপসর্গে জর্জরিত! আমি চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু ওইজন্যই কাগজগুলো হাতে পেতে ব্যর্থ হই। এমনকি সদ্যঅবসরপ্রাপ্ত একজন সহকর্মী, যিনি এই তদন্তের দায়িত্বে ছিলেন; তিনিও কাগজগুলো গুছিয়ে দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে তাঁর অপারগতার কথা জানান, কারণ শোনা যায় তিনি অন্যায্য বেআইনি ও অনৈতিকভাবে এপিআইয়ের হিসাব করা সুবিধাভোগী লোকজনের কাছ থেকে হুমকি পাচ্ছিলেন! যদিও মানবসম্পদবিকাশ মন্ত্রকের নির্দেশ অনুসরণ করেই এগুলির তদন্ত হবে। এখন যদি উচ্চতর কর্তৃপক্ষ কোনও চূড়ান্ত প্রতিকূল সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে তাতে শুধু যে বিশ্বভারতীর কলঙ্ক হবে তা নয়, তার ভবিষ্যৎও বিপন্ন হয়ে পড়বে। এই সাংঘাতিক অসংগত কাজের প্রতিফল পেতে হবে যাঁদের, তাঁদেরও বক্ষঃশূলের কারণ হতে হবে প্রশাসনকেই!

এখানে বলা অসমীচীন হবে না যে মানবসম্পদ বিকাশ মন্ত্রক আমার একজন পূর্বসূরি, অধ্যাপক সুশান্ত দত্তগুপ্তের আমলের ছাপান্নটি 'অবৈধ' নিয়োগের একটা তালিকা তৈরি করে রেখেছে। এই তালিকায় অভিযোগ করা হয়েছে এই পদপ্রার্থীদের নিয়োগ হয়েছিল সবরকম বিধিনিয়ম অগ্রাহ্য করে। আমি যোগ দেওয়ার পর 'অবৈধ' নিয়োগের এই সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে চব্বিশ, এবং বিষয়টি আমাকে তদন্ত করে দেখতে বলা হয়েছে। মানবসম্পদবিকাশ মন্ত্রকের নির্দেশ অনুসারে আমি তদন্তের কাজ শুরু করেছি। প্রাথমিক রিপোর্ট দেখে মনে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে *দৃশ্যত* নির্বাচন প্রক্রিয়ায় দুঃখজনকভাবে নিয়ম-লঙ্ঘনের অনেক অসংগতি-চিহ্ন রয়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রেও তদন্তের ফল সুখকর হবে না যদি প্রমাণ হয় যে নিয়োগপত্রগুলি দেওয়া হয়েছিল নিয়ম লঙ্ঘন করে। যাঁদের নিয়োগ অবৈধ ঘোষণা করা হবে তাঁরা তখন বিশেষভাবে উপাচার্য আর সাধারণভাবে তাঁর প্রশাসনিক সহকর্মীদের মুণ্ডপাত করবেন!

৮। **বৈচিত্রকে গ্রহণ ও স্থান দেওয়ার সদিচ্ছা:** আমার পাঠকেরা হয়তো অবগত আছেন যে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মন্দিরের সাপ্তাহিক উপাসনার ক্ষেত্রে একটা মৌলিক পরিবর্তন এনেছে। পরিবর্তনের প্রশ্নে সবচেয়ে গৌরবের বিষয় হল, সমাজের বিভিন্ন পটভূমি থেকে উঠে আসা মানুষজনকে মন্দিরের আচার্য পদে মনোনীত করা হয়েছে। লকডাউন-পববর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত উপাসনায় বরণ করে নেওয়া হয়েছে সেইসব মানুষকে যাঁরা কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে সামনে থেকে লড়াই করে চলেছেন। এঁরা হলেন ডাক্তার, সাফাইকর্মী, নিরাপত্তাকর্মী এবং পুলিশ। বিশ্বভারতীর সীমিত-সংকীর্ণ পরিসরগুলির গণতন্ত্রীকরণ আমাদের লক্ষ্য; যে লক্ষ্য সামনে রেখে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ জাতি-ধর্ম-সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে প্রতিবেশী গ্রামগুলিকে বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত

করার কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে মন্দির যতটা অধ্যাত্মচর্চার স্থান ছিল তার চেয়ে কোনও অংশে কম ছিল না(মানুষের)একত্রীকরণ ও পারস্পরিক সংহতি-জ্ঞাপনের ক্ষেত্র। আমরা আশা করতে পারি আচার্যপদের বৈচিত্রকরণের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের সংযুক্তি ও সৌভ্রাতৃত্বের ভাবনা ফলপ্রসূ হবে।

৯। **সময়ের সঙ্গে চলতে পারার সদিচ্ছা:** সম্ভবত এটাই হচ্ছে এই বার্তালাপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা। এই কথাটিই হয়তো আগে বলা প্রত্যেকটি কথাকে ঘিরে আছে। প্রশাসনিক বা অন্য কোনও ক্ষেত্রে পদক্ষেপের সময় নিকট-অতীতে আমার সহকর্মীদের কথাবার্তায় একটা অন্তর্নিহিত উদ্বেগ লক্ষ করেছি; সেটা হল 'ভয়ানক পরিবর্তনভীতি'। এর মূলে রয়েছে পরিবর্তনকে ভালর জন্য প্রগতি বা বিবর্তন না ভেবে 'বিচ্যুতি' বলে ধরে নেওয়া! আমার বিশ্বাস, এই ধারণা যে কতটা সাংঘাতিকরকম পশ্চাদ্‌মুখিতা তা ব্যাখ্যা করে না বললেও চলে। শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে 'ঐতিহ্য' বলতে অচল-অনড় একমাত্রিক কোনও ধারণা বোঝায় না; আমরা নিয়ত 'ঐতিহ্য' রচনা করি। রবীন্দ্রনাথ একটা শক্তপোক্ত ভিতের উপর বিশ্বভারতী গেঁথেছিলেন, এখন এই পরিবর্তনের হাওয়ায় এটাকে ঘাতসহ ও ধারণক্ষম প্রতিষ্ঠান হিসেবে আরও মজবুত করে তোলার দায়িত্ব বর্তায় আমাদেরই উপর।

আন্তর্জাতিক বিদ্যামঞ্চে বিশ্বভারতীকে আবার তার পুরনো যথাযথ অবস্থানে ফিরিয়ে আনার জন্য কী করা কর্তব্য তার একটা রূপরেখা দেওয়া গেল এই বার্তালাপে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই লক্ষ্য স্পর্শ করা খুবই সম্ভব যদি আমরা বিশ্বভারতীর অতীত গৌরব স্মরণে রাখি; এবং একইসঙ্গে যুগের হাওয়ার অনুপন্থী হয়ে নিজেরাও গ্রহিষ্ণু হয়ে উঠতে পারি। বিশ্বভারতীর পরম্পরার ধারক হিসেবে এই দায়িত্ব বর্তায় প্রশাসন, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, প্রাক্তনীসহ অন্যসব শরিকবন্ধুদের উপর; বিশ্ববিদ্যালয়ের মঙ্গলের জন্য যাঁদের ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। এখন সময় এসেছে ব্যক্তিস্বার্থ-চরিতার্থতার প্রোথিত দৃঢ়মূল উপড়ে বেরিয়ে আসার— যা বিশ্বভারতীর অগ্রগতিকে স্তব্ধ করেছে; এবং বিশ্বভারতীর শুভানুধ্যায়ীদের কাঙ্ক্ষিত শিখরস্পর্শের পথ রুদ্ধ করেছে।

কোভিড-১৯-এর প্রকোপ এখনই কমার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এই অদৃশ্য শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য শারীরিকভাবে না হলেও সমষ্টিগতভাবে এইসময় আমাদের আরও আত্মিকতার সঙ্গে কাছাকাছি আসতে হবে। এইজন্য আরও একবার আমি আপনাদের সবার কাছে নিবেদন করি, আপনারা শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে সামাজিকভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকুন। দয়া করে মাস্ক পরুন এবং নিরাপদ থাকুন।

আস্থা রাখুন।

বিদ্যুৎ চক্রবর্তী ১/০৬/২০২০

বিদ্যুৎ চক্রবর্তী

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

Vice-Chancellor
Visva-Bharati
Santiniketan
West Bengal-731235
India